ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্‌নূর রহমান

নাজমুল হুদা মিনা

গোলাম মহিউদ্দীন

৫ ডিসেম্বর ২০১৯

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক*, *টিআইবি*
প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা*, *টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধানে
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা দল
মো. শাহ্নূর রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
গোলাম মহিউদ্দীন, *সাবেক প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ*

গবেষণা সহকারী
বি.এম. শাকিল ফয়সাল

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, আব্দুল্লাহ আল আরমান, মোহাম্মদ হোসাইন, মো: সালমান ফারুক

প্রতিবেদন প্রকাশ: ৫ ডিসেম্বর ২০১৯

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, রোড # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে নীতি কৌশল, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের জন্য অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

মিয়ানমার সরকারের দমন-পীড়নের শিকার হয়ে ২০১৭ সালে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত। সম্পদের স্বল্পতা ও সক্ষমতার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিওসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। ২০১৭ সালের অনুপ্রবেশ বৃহৎ ও আকস্মিক হওয়ায় রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ থাকার সম্ভাবনা ও এর গুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি ২০১৭ সালে একটি দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনা করে এই সমস্যার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করে যা ১ নভেম্বর ২০১৭ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে অধিকতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং বর্তমানে এ সমস্যার বহুমুখী প্রভাব এবং এর বিভিন্ন প্রকার উদ্বেগজনক দিক ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অব্যাহত অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট সহায়তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর অধিকতর আলোকপাত করার জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

এই গবেষণায় রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, সাড়া প্রদান, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যাবর্তন বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ আলোকপাত করা হয়েছে। অপরদিকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ায় সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশবেশগত প্রভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও'র কর্মকর্তা, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকসহ যেসকল অংশীজন তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. শাহনূর রহমান, নাজমুল হুদা মিনা ও প্রাক্তণ সহকর্মী গোলাম মহিউদ্দীন। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি এই গবেষণা কার্যক্রমে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ গবেষণাটির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক হবে এবং এক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার মাত্রা উন্নততর করে তুলতে সাহায্য করবে বলে আশা করছি।

এ প্রতিবেদনের যে কোনো বিষয়ে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৩
অধ্যায়: এক ৬
ভূমিকা ৬
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ৬
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৭
১.৩ গবেষণার পরিধি ও সময়কাল ৮
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৮
১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো ৯
অধ্যায়: দুই ১০
রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা ১০
২.১ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ১০
২.২ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উদ্যোগ ১০
২.৩ বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কিত অনুমোদন ও ছাড়পত্র ১১
২.৪ ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা ১২
২.৫ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ১২
২.৫.১ ত্রাণের উৎস ও ধরন ১২
২.৫.২ ত্রাণের পরিমাণ ও মান যাচাই ১৩
২.৫.৩ ত্রাণ বিতরণ ১৪
অধ্যায়: তিন ১৫
মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ ১৫
৩.১ খাদ্য ও পুষ্টি ১৫
৩.২ শিক্ষা ১৭
৩.৩ স্বাস্থ্য ১৮
৩.৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ১৯
৩.৫ আশ্রয় ২০
৩.৬ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ২০
অধ্যায় চার ২২
রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ২২
৪.১ সমন্বয়ের ঘাটতি ২২
৪.২ ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি ২২
৪.৩ আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি ২৩
৪.৪ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ ২৪
৪.৫ অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৫
অধ্যায়: পাঁচ ২৭
প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ ও বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি ২৭
৫.১ প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ ২৭
৫.২ রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের ঝুঁকি ২৭
৫.২.১ অর্থনৈতিক ঝুঁকি ২৭
৫.২.২ সামাজিক ঝুঁকি ২৮
৫.২.৩ নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ঝুঁকি ২৯
৫.২.৪ পরিবেশগত ঝুঁকি ২৯
অধ্যায়: ছয় ৩১
উপসংহার ও সুপারিশ ৩১
৬.১ সুপারিশ ৩১
সহায়ক তথ্যসূত্র ৩৩

চিত্র ও সারণির তালিকা

সারণি ১ : বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের আগমন ও প্রত্যাবাসনের সংখ্যা ৬
সারণি ২: খাতভিত্তিক সমন্বয়ে নেতৃত্বদানকারী অংশীজন ১০
সারণি ৩: রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় (২০১৭-২০১৯) জাতিসংঘের ৭টি অঙ্গসংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরিচালন ব্যয় ও কর্মসূচি ব্যয়ের হার ২৪
সারণি ৪: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত ও পরিমাণ.. ২৬
সারণি ৫: রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ (২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত) ২৮

চিত্র ১: বিশ্লেষণ কাঠামো.. ৮
চিত্র ২: এফডি-৭ এর আওতায় এনজিও'র কার্যক্রমের অনুমতি প্রক্রিয়া ১১
চিত্র ৩: এফডি-৭ এর আওতায় এনজিও'র কর্মসূচী সমাপ্তির ছাড়পত্র প্রক্রিয়া... ১১
চিত্র ৪: ত্রাণের ধরন ও উপাদানসমূহ...১৩
চিত্র ৫: ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের প্রক্রিয়া ১৩
চিত্র ৬: মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় বছরভিত্তিক আর্থিক প্রয়োজন ও প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন ডলার) ২৩
চিত্র ৭: ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মৌলিক চাহিদার খাতভিত্তিক আর্থিক প্রয়োজন ও প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন ডলার) ২৩

ভূমিকা

১.১ *প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা*

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ একটি পুরানো সংকট। ১৯৭৮-২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকারের দমন-পীড়নের ফলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার সরকার প্রথম 'অপরেশান নাগমিন' (ড্রাগন কিং) পরিচালনার মাধ্যমে রাখাইন এবং কাচিন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর দমন পীড়ন ও গণহত্যা শুরু করে। এর ফলে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার আলোচনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত নেয়ার জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৭৯ সালে এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। বাকি বিশ হাজার জনের মধ্যে ১০ হাজার জন বিভিন্ন সময়ে মারা যায় এবং ১০ হাজার জন নিখোঁজ ছিল।

১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকার তার নাগরিক আইনে রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় টানাপোড়েন তৈরি হয়। গণহত্যা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে ১৯৯১ হতে ২০১৭ সালের জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কাঠামোগত কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নেয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (আরআরআরসি) গঠন করে। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের (ইউএনএইচসিআর) মধ্যস্থতায় দুই লাখ ৩০ হাজার শরণার্থীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে ৭ লাখ ৪১ হাজার ৮৪১ জন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে যা স্মরণকালের ভয়াবহতম অনুপ্রবেশ এবং পৃথিবীর দ্রুততম শরণার্থী বিপর্যয়।[১]

সারণি ১ : বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের আগমন ও প্রত্যাবাসনের সংখ্যা

সাল	রোহিঙ্গাদের আগমন	প্রত্যাবাসন
১৯৭৮	২,০০,০০০	১,৮০,০০০
১৯৯১	২,৫০,০০০	২,৩০,০০০
২০১২	১,২০,০০০	
২০১৪	৮৭,০০০	
২০১৬	৯০,০০০	
২০১৭ জুলাই পর্যন্ত	৭৪,০০০	
২০১৭ আগস্ট থেকে বর্তমান	৭,৪১,৮৪১	

জাতিসংঘ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে 'নিগৃহীত জনগোষ্ঠী'[২] হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের এই নৃশংসতাকে 'জাতিগত নিধন' হিসেবে অভিহিত করেছে। এছাড়া অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা একে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'[৩] হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রোহিঙ্গা সংকটের ফলে শুধু বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না, বরং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য অনেক দেশের সরকার ও মানুষের উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পূর্বে যেখানে বাংলাদেশ ইউএনএইচসিআর-এর শীর্ষ শরণার্থী আশ্রয় প্রদানকারী দেশের তালিকায় ছিল না, সেখানে বর্তমানে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম শরণার্থী আশ্রয়প্রদানকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত[৪]। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। জাতীয়ভাবেও এ বিশাল অনুপ্রবেশের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাগত জানানো হয়, যদিও এর বহুমুখী প্রভাব ও বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

---

[১] Situation report, ISCG, July 2019

[২] দি কনভারসেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৭, https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040

[৩] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/

[৪] Crisis within the Crisis, COAST and CCNF, July 2018

রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে অধিকাংশ গবেষণা ২০১৭ সালের আগে রোহিঙ্গাদের আগমনের ওপর করা হয়েছে। এসব গবেষণায় রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, শরণার্থীদের অবস্থা এবং প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের সাথে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সম্পর্ক বিষয়ক ইতিহাস বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেমন ইব্রাহীম (২০১৬), ওয়েড (২০১৭), পারনিনি (২০১৩), ডুসিস (২০১৮) এবং আনওয়ারি (২০১৯) যেখানে বর্তমান সংকটের বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অভিজ্ঞতা সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। চেয়াং (২০১২) তাঁর গবেষণায় ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা তুলনা করেছেন। এ গবেষণায় তিনি রোহিঙ্গাদের আনুষ্ঠানিক আশ্রয়ের বাহিরে একধরনের সুরক্ষা কৌশল ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থার বিষয় চিহ্নিত করেন যা রোহিঙ্গাদের স্থানীয়ভাবে একীভূত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। উল্লাহ (২০১৪) বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার কুতুপালং এবং নয়াপাড়া ক্যাম্পের ১৩৪ জন শরণার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে মূলত রোহিঙ্গাদের নিগৃহীত হওয়ার মাত্রা এবং প্রত্যাবসিত হওয়ার উপায় চিহ্নিত করেন। অপরদিকে, কেআউ (২০১৭) রোহিঙ্গাদের দেশহীন হওয়া এবং মিয়ানমার সরকারের নাগরিক আইন পাশের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। আলম (২০০১) রোহিঙ্গাদের দেশহীন হওয়ার কারণ ও রোহিঙ্গাদের সংখ্যালঘু হওয়ার সাথে সাথে বার্মিজ জাতীয়তাবোধের উত্থানের ওপর আলোকপাত করেন। সব গবেষকের মতে এ সংকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং বাংলাদেশের জন্য জাতীয় স্বার্থ ও মানবিক সহাতা বিবেচনায় এ সংকটের কার্যকর সমাধান খুঁজে পাওয়াও একটি চ্যালেঞ্জ।

২০০৬ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ও ইউ ফোর অ্যান্টি করাপশন রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবেদনটিতে মানবিক সহায়তা প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক মূল্যায়ন ও কর্মসূচি নকশা, তহবিল সংগ্রহ এবং বণ্টন, স্থানীয় সংস্থার সাথে কাজের ক্ষেত্র, লজিস্টিকস, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ এবং তাদের নিবন্ধন, কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ প্রশাসনিক তদারকি ও কর্মী ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির ঝুঁকি থাকে বলে চিহ্নিত করা হয়[৫]। এক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি সাধারণত মানবিক কার্যক্রমের ধরন ও অবস্থা, মানবিক সহায়তার জটিল ব্যবস্থাপনা ও এর সাথে জড়িত অংশীজনের ধরন এবং জরুরি অবস্থার ধরনের ওপর নির্ভর করে।

২০১৭ সালের অনুপ্রবেশ সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহৎ হওয়ায় এবং স্বল্প সময়ে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়ার ফলে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা ও এর গুরুত্ব বিবেচনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৭ সালে একটি দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় এ বিশাল সমস্যার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করার পাশাপাশি সুশাসন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রোহিঙ্গাদের আগমন ও আশ্রয় স্থাপনে দুর্নীতির শিকার; ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে অসমতা; ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎসহ নানবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে[৬]। সাম্প্রতি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বড় অংশ এখনো একই মাত্রায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বর্ধিত পরিসরে বিদ্যমান। এছাড়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে অধিকতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করার জন্য বর্তমান ফলো-আপ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

১. রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা;
২. রোহিঙ্গাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণের পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
৩. সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

[৫] Ewins.P, Harvey.P, Savage.K and Jacobs.A, 2006, 'Mapping the risk of corruption in humanitarian action' *A report for Transparency International and U4 anti corruption recourse centre.*
[৬] "বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা, টিআইবি, ২০১৭

১.৩ গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামোটি আন্তর্জাতিক শরণার্থী ব্যবস্থাপনা কাঠামোর[৭] ধাপ বা কাঠামোর (সীমান্ত অতিক্রম, আগমন, সাময়িক অবস্থান এবং প্রত্যাবর্তন) পরিমার্জনে তৈরি করা হয়েছে। এই চারটি ধাপের মধ্যে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত ২০১৭ সালের গবেষণায় দুই'টি ধাপ যথাক্রমে রোহিঙ্গাদের 'সীমান্ত অতিক্রম' এবং 'আগমন'-এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান গবেষণায় রোহিঙ্গাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় মৌলিক চাহিদা বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা, সমন্বয়, সাড়া প্রদান এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অপরদিকে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান এবং তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশবেশগত প্রভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি ২০১৯ সালের ১৩ জুলাই থেকে ৩০ অক্টোবর সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

চিত্র ১: বিশ্লেষণ কাঠামো

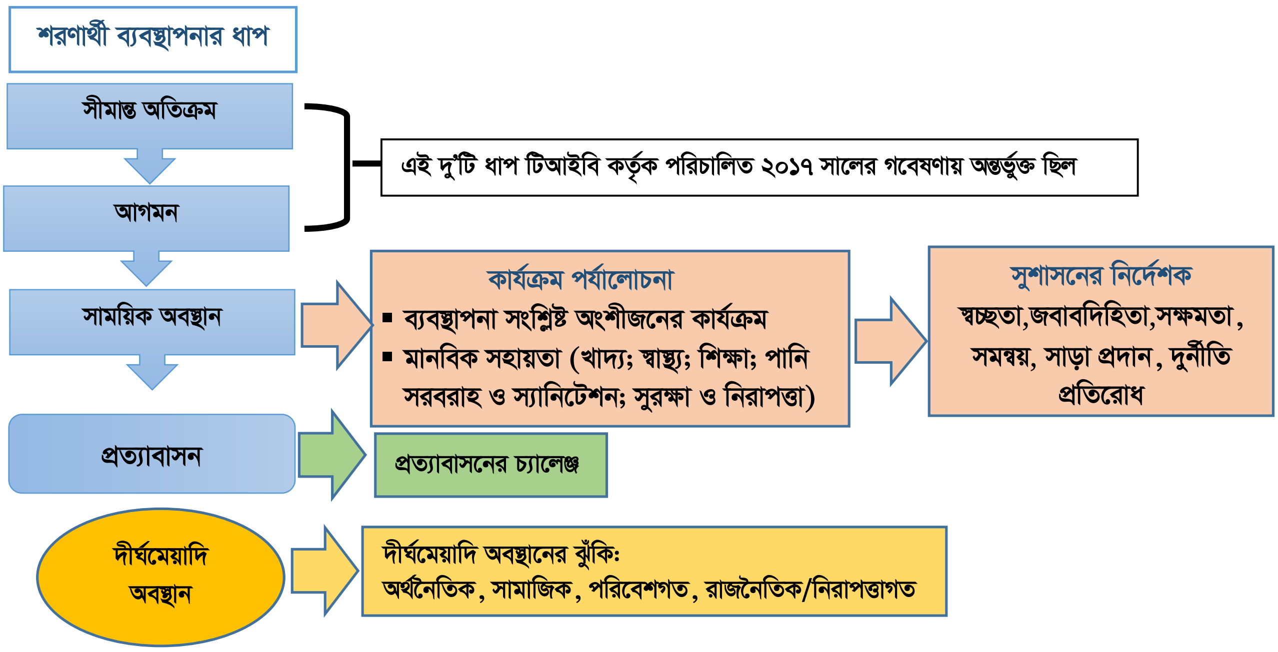

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও মাঠ পর্যবেক্ষণে ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়, ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ, ক্যাম্প-ইন চার্জ (সিআইসি), সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়, বন বিভাগ, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য হিসেবে রোহিঙ্গা সংকট ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের

[৭] Managing the refugee crisisBuilding capabilities to manage refugee influx in country, Global Crisis Centre. https://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/pwc-managing-the-refugee-crisis.pdf

মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া আশ্রয় ক্যাম্পের প্রকারভেদে নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি ও সময়কাল আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের নিরূপণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ ও বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত ঝুঁকি আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা

২.১ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সরকারি অংশীজন

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারি অংশীজন হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয় খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এফডি-৭[৮] এর আওতায় এনজিওগুলোর কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদান করছে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ে (কক্সবাজারে) ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়। এছাড়া যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে।

বেসরকারি অংশীজন

হিউম্যানিটারিয়ান অংশীজনদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কৌশলগত নির্বাহী দল (এসইজি) নেতৃত্ব প্রদান করছে, যার সহপ্রধান হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) চীফ অব মিশন, জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) প্রতিনিধি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন খাতভিত্তিক কাজে (খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয়, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) সমন্বয়ের জন্য রয়েছে ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)। উল্লেখ্য সাতটি খাতের সবগুলোতেই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ নেতৃত্বে রয়েছে।

সারণি ২: খাতভিত্তিক সমন্বয়ে নেতৃত্বদানকারী অংশীজন

খাত	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা
শিক্ষা	ইউনিসেফ
	সেভ দ্য চিলড্রেন
খাদ্য নিরাপত্তা	ডব্লিউএফপি
	মুক্তি
স্বাস্থ্য	ডব্লিউএইচও
পুষ্টি	ইউনিসেফ
সুরক্ষা	ইউএনএইচসিআর
শিশু সুরক্ষা	ইউনিসেফ
লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধ	ইউএনএফপিএ
আশ্রয়	আইওএম
	কারিতাস
ক্যাম্প এলাকা ব্যবস্থাপনা	আইওএম
	ইউএনএইচসিআর
	ডিআরসি
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	এসিএফ
	ইউনিসেফ

২.২ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উদ্যোগ

২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় রোহিঙ্গা সংকটের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিসহ সুশাসন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করার পাশপাশি এর থেকে উত্তরণে যেসব সুপারিশ করা হয়, তার মধ্যে নিচের উদ্যোগগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

[৮] রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্মসূচিতে কোনো সংস্থা যদি বৈদেশিক অনুদান/ তহবিলের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে তবে তা সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অনুমোদন নিতে হয়। উল্লেখ্য, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পের (১ বছর কিংবা ততোধিক) ক্ষেত্রে সাধারণত এফডি-৬ এর অনুমোদন নিতে হয় কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরকার কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের অনুমোদন না দেওয়ায় এনজিওগুলোকে এফডি-৭ এর অনুমোদন নিতে হচ্ছে।

- অনাথ শিশুদের (৩৬,৩৭৩ জন) তালিকা সম্পন্ন করা;
- অভিযোগ নিরসণে "কমপ্লেইন ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট" ব্যবস্থা চালু করা;
- পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নিরূপণে সমীক্ষা পরিচালনা ও ক্ষতিরোধে সুপারিশ প্রণয়ন;
- অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে পূর্বে প্রচলিত ত্রাণের টোকেনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের কার্ড, যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড, অ্যাসিস্ট্যান্স কার্ড, ফ্যামিলি কাউন্ট কার্ড, আরসিএন কার্ড, ফুয়েল কার্ড ও ফুড কার্ড চালু করা;
- আইএসসিজি ও আরআরআরসি'র কার্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট বিরতিতে যথাক্রমে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' এবং 'মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা' প্রকাশ; এবং
- মানবিক সহায়তায় বিভিন্ন খাতের বছরভিত্তিক (২০১৭-১৯) আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করা।

এছাড়া অন্যান্য গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পগুলো পরিচালিত করা; ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় ২৮টি সিআইসি অফিস নির্মাণ ও সিআইসি নিয়োগ; রোহিঙ্গাদের জন্য ভাসানচরে আবাসন নির্মাণ: ১২০টি গুচ্ছগ্রাম ১,৪৪০টি ব্যারাক ও ১২০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যৌথ ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা; আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহস্থালী বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রকল্প গ্রহণ; ১,২৭,৮৫২টি পরিবারকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি সরবরাহ; ই-ভাউচার পদ্ধতিতে প্রতি রোহিঙ্গার জন্য মাসিক ৭৭০-৭৮০ টাকা মূল্যের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা চালু; এবং ক্যাম্পের ভেতরে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে দুইটি ক্যাম্পের দুইটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্যাম্প প্রতিনিধি বাছাই উল্লেখযোগ্য।

২.৩ বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কিত অনুমোদন ও ছাড়পত্র

রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো দীর্ঘমেয়াদী না হওয়ায় এফডি-৭ এর অনুমোদন নিতে হয়। এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এনজিওকে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে কার্যক্রমের বিবরণসহ একটি সুপারিশ ব্যুরোতে জমা দিতে হয়। এরপর ব্যুরো হতে অনুমোদন পাওয়ার পর কাজ শুরুর পূর্বে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অনুমতি নেওয়ার পাশাপাশি আরআরআরসি হতেও কাজ শুরুর অনুমোদন নিতে হয়। সংশ্লিষ্ট এনজিও'র কার্যক্রম সদর উপজেলার বাইরে বা অন্য কোনো উপজেলায় হলে (এক্ষেত্রে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা) একইভাবে ইউএনও কার্যালয় থেকেও অনুমতি নিতে হয়। আবার ক্যাম্প পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একইভাবে অনুমতি আরেকবার নিতে হয় সিআইসি'র কাছ থেকে। পরবর্তীতে কাজ শেষ হওয়ার পর একইভাবে উল্লিখিত প্রতিটি পর্যায় থেকে কার্যসম্পাদনের ছাড়পত্র নিতে হয়।

চিত্র ২: এফডি-৭ এর আওতায় এনজিও'র কার্যক্রমের অনুমতি প্রক্রিয়া

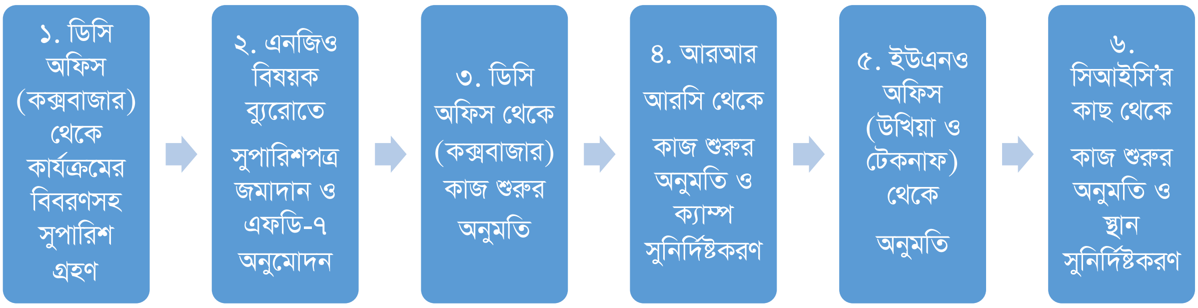

চিত্র ৩: এফডি-৭ এর আওতায় এনজিও'র কর্মসূচী সমাপ্তির ছাড়পত্র প্রক্রিয়া

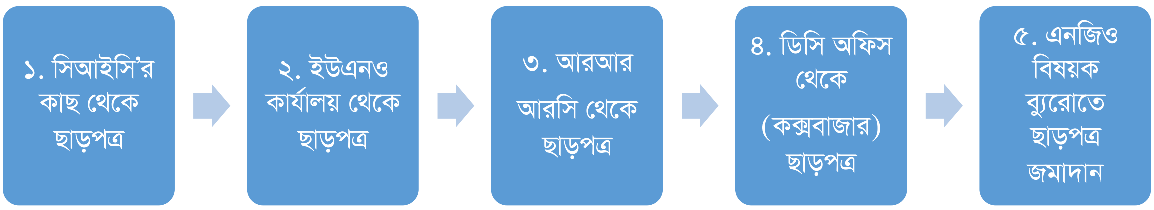

২.৪ ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবিক সহায়তায় সকল খাতের কার্যক্রমের সমন্বয় করা হয়। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় মূলত চার ধরনের কাজ হয়ে থাকে - সমন্বয়, তথ্য ব্যবস্থাপনা, ক্যাম্প অভ্যন্তরের কাঠামোগত উন্নয়ন এবং অভিযোগ নিস্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা। এক বা একাধিক ক্যাম্পের জন্য আরআরআরসি হতে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সরকারি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধায়নে ক্যাম্পের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সার্বিকভাবে আইওএম ও ইউএনএইচসিআর-এর নেতৃত্বে ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্যাম্প ও সাইট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। মূলত এ সকল সংস্থা ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় সিআইসিদের সহায়তা করে থাকে। সিআইসি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

১. সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরতদের সহযোগিতায় অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, নিরাপত্তা তল্লাশী কেন্দ্র, পুলিশ/ আনসারদের জন্য ব্যারাক, বিদ্যালয়/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সভাকক্ষ, প্রশাসনিক ও আবাসিক কক্ষ, কবরস্থানসহ অন্যান্য সেবা প্রদান কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি নির্বাচন ও সংরক্ষণ করা;

২. WASH কার্যক্রমের সমন্বয় করা। ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নির্মাণ, তারপলিন, প্লাস্টিক সীট, তাঁবু, খাদ্য, পানীয়, ঔষধসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মধ্যে সরবরাহ করা;

৩. সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে রোহিঙ্গাসহ ক্যাম্পে কর্মরত সকল কর্মীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;

৪. ক্যাম্পে অবস্থানরতদের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তালাক ইত্যাদি নথিভুক্তকরণ;

৫. ক্যাম্প এলাকায় কর্মরত সকল সরকারি সংস্থা ও এনজিওসহ অন্যান্য সকল সংস্থার কর্মীদের তথ্য, যোগাযোগের জন্য ফোন নাম্বার, ফোকাল পয়েন্টদের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেন একই কাজে একাধিক সংস্থা নিয়োজিত না হয়;

৬. বন্যা ও ভূমিধস এর ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গাদের যথাসময়ে স্থানান্তর করা;

৭. ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা;

৮. সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহায়তায় ক্যাম্পের সকল সেবাদানকারী স্থাপনা, যেমন নলকূপ, পায়খানা ইত্যাদির তালিকা সংরক্ষণ করা;

৯. ক্যাম্পে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার সাথে সাপ্তাহিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা;

১০. অনুমতি ছাড়া কোন সংস্থা যেন ক্যাম্পে কাজ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা;

১১. আরআরআরসি অফিসে অনুষ্ঠিত সিআইসিদের সমন্বয় সভায় নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

২.৫ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা

২.৫.১ ত্রাণের উৎস ও ধরন

২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকটের প্রারম্ভিকে ত্রাণের বিভিন্ন উৎস থাকলেও বর্তমানে তা মূলত সরকার, জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা থেকে আসছে। ত্রাণসমূহ মূলত দুই প্রকার যথা: নিয়মিত ত্রাণ যা সবার জন্য নির্দিষ্ট বিরতিতে প্রদেয় এবং বিশেষ ত্রাণ যা পরিমাণে স্বল্প এবং ক্ষেত্রবিশেষ প্রদান করা হয়। নিয়মিত ত্রাণের ক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী ও এর বাইরের উপাদান উভয়ই রয়েছে। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল ও তেল এবং এর বাইরে রয়েছে জ্বালানি ও আশ্রয় সামগ্রী। বিশেষ ত্রাণ হিসেবে প্রদান করা হয় বস্ত্র, নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট, বিশেষ খাবার ও হাইজন কিটস্। ত্রাণ সংগ্রহ করতে ভিন্ন ভিন্ন কার্ড ব্যবহৃত হয় যেমন: বায়োমেট্রিক কার্ড, অ্যাসিস্ট্যান্স কার্ড, ফ্যামিলি কাউন্ট কার্ড, আরসিএন কার্ড, ফুয়েল কার্ড ও ফুড কার্ড উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৪: ত্রাণের ধরন ও উপাদানসমূহ

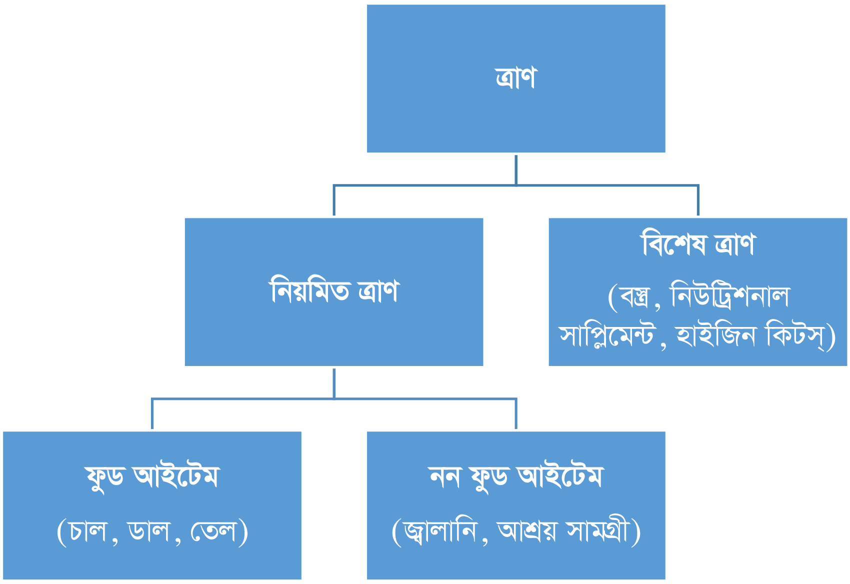

২.৫.২ ত্রাণের পরিমাণ ও মান যাচাই

ত্রাণের পরিমাণ ও মান যাচাই ব্যবস্থা ত্রাণের উৎসের ধরনের উপর নির্ভর করে। সরকারি উৎস থেকে আগত ত্রাণ সরাসরি সরকারি গুদামে যায়। জাতিসংঘ ও এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত ত্রাণ সরাসরি তাদের নিজস্ব ওয়্যারহাউসে যায়। তবে এই দুই উৎসের ত্রাণের কোনো কাঠামোগত মান ও পরিমাণ যাচাই ব্যবস্থা নেই।

এফডি-৭ এর আওতায় পরিচালিত কর্মসূচির ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের মূলত কাঠামোগত ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রাণ প্রথমত তাদের নিজস্ব ওয়্যার হাউসে যায়। সেখান থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে যারা এই যাচাইয়ের কাজটি করে থাকেন। এই কমিটিতে রয়েছে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিএসবি এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের পর তা উখিয়াতে অবস্থিত কন্ট্রোলরুমে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওয়্যারহাউজে গুদামজাত করার পূর্বে আরেকবার মান ও পরিমাণ যাচাই করেন। তাছাড়া প্রত্যেক ক্যাম্পে বিতরণের পূর্বে ক্যাম্পের সিআইসি অফিসও মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের ক্ষমতা রাখেন।

চিত্র ৫: ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের প্রক্রিয়া

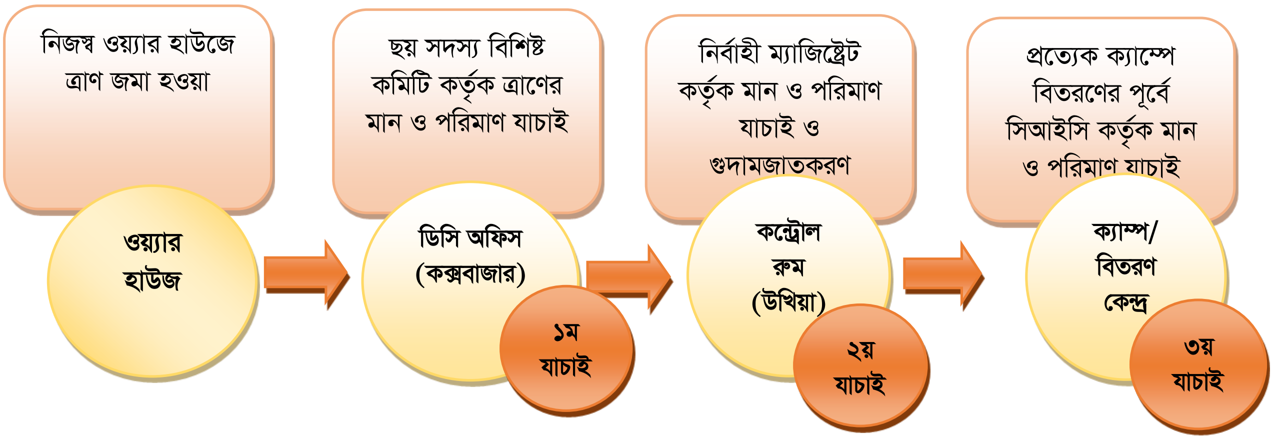

২.৫.৩ ত্রাণ বিতরণ

সরকারি উৎস থেকে প্রাপ্ত ত্রাণ প্রধানত সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বিতরণ হয়। জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা থেকে ত্রাণ বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিতরণ কেন্দ্র রয়েছে। ধরন অনুযায়ী ত্রাণসমূহ যে খাতের আওতায় পড়ে সেই খাতের সমন্বয়ে নেতৃত্ব প্রদানকারি সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প এবং বিতরণের দিন নির্ধারণ করা হয়। ক্যাম্পভিত্তিক ত্রাণ প্রদানের আনুষ্ঠানিক অনুমতি সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর কাছ থেকে নিতে হয়।

অধ্যায়: তিন

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে শরণার্থীদের মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের জন্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে[৯]। এর মধ্যে তিনটি অধিকার - মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের অধিকার, মানবিক সহায়তা পাওয়ার অধিকার এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন বলতে শুধু শারীরিকভাবে ভাল থাকাকে বোঝায় না, বরং তাদের সমগ্র ব্যাক্তিসত্ত্বাকে সম্মান করাও বোঝায়, যেমন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস, মানবাধিকার ও মুক্ত চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। শরণার্থীদের মানবিক সহায়তার মূল বিষয় হলো সকল ধরনের ঝুঁকি নিরসন করার ব্যবস্থা করা[১০]। আইন অনুযায়ী এই সহায়তা নিরপেক্ষভাবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের বৈষম্য অর্থাৎ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয়, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, পঙ্গুত্ব, স্বাস্থ্যের অবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তা, জাতিগত ও সামাজিক পরিচয় ইত্যাদি কোনো কিছুর ভিত্তিতেই কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।[১১]

শরণার্থীদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৫১ সালে জাতিসংঘ একটি কনভেনশন গ্রহণ করে, যা ১৯৬৭ সালের প্রটোকল হিসাবে সংশোধিত হয়।[১২] কিন্তু বাংলাদেশ ওই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি। ফলে শরণার্থীদের জন্য যেসব অধিকার বা সুবিধা নিশ্চিত করতে হয় সেগুলো করার জন্য বাংলাদেশের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ওই কনভেনশনে স্বাক্ষর না করলেও বেশ কয়েকটি সনদে স্বাক্ষর করার পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের (ইউএনএইচসিআর) নির্বাহী কমিটির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অর্ন্তভূক্ত[১৩]। ফলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের কিছু মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে বাংলাদেশের দায়িত্ব রয়েছে[১৪]। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ খাদ্য ও পুষ্টি

২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিতে প্রয়োজন ছিলো যথাক্রমে ২৫৫ মিলিয়ন ও ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে যথাক্রমে ১৫৯ মিলিয়ন ও ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে যা প্রয়োজনের

---

[৯] সার্বজনিন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২১৭ এ (III) রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 1948;
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬, ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২২০০ এ (XXI) রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২৩ মার্চ কার্যকরহ য়। *United Nations, Treaty Series, Vol.999, p. 171 and vol. 1057, p. 407. www2.ohcr.org/English/law/ccpr.htm*
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬, ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২২০০ অ (XXI) নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ৩ জানুয়ারি, ১৯৭৬ কার্যকর হয়। *United Nations, Treaty Series, Vol.993, p. 3 www2.ohcr.org/English/law/cescr.htm*
সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৯, ১৯৬৫ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২১০৬ (XX) নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ কার্যকর হয়।
নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৭৯ (সিডো), ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৪/১৮০ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩ ডিসেম্বও কার্যকর হয়। *United Nations, Treaty Series, Vol.1249, p. 13 www2.ohcr.org/English/law/cedaw.htm*
শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৪/২৫ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ কার্যকর হয়। *United Nations, Treaty Series, Vol.1577, p. 3 www2.ohcr.org/English/law/crc.htm*
প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি ২০০৬, ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (অ/জউঝ/৬১/১০৬) নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ২০০৮ সালের ৩ মে কার্যকর হয়। *United Nations, Treaty Series, chapter* IV, p.15 *www2.ohcr.org/English/law/disabilities-convention.htm*

[১০] স্ফিয়ার প্রজেক্ট (২০১১) *'মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়াদানের ন্যূনতম মান'* , ফাউন্ডেশন ফর ডিজাস্টার ফোরাম,ঢাকা, বাংলাদেশ

[১১]Yesmin.S (2016) '*Policy towards Rohingya Refugees: A comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia and Thiland*' Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol (61), pp71-100

[১২] শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৫১ (সংশোধিত), ১৯৫১ সালের ২-২৫ জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিত শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ১৯৫৪ সালের ২২ এপ্রিল কার্যকর হয়। United Nations Treaty Series, vol. 189, p.137| শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত প্রটোকল ১৯৬৭, ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২১৯৮ (xxi) ২ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। United Nations Treaty Series, vol. 189, p.137

[১৩] https://www.unhcr.org/4666d23b0.pdf

[১৪] Yesmin.S (2016) '*Policy towards Rohingya Refugees: A comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia and Thiland*' Journal of the Asiatic Society of Bangladesh

যথাক্রমে ৬২% ও ৩৫%।[১৫] খাদ্য কর্মসূচি ইন-কাইন্ড বা বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ (চাল, ডাল ও তেল) এবং ই-ভাউচার এ দু'টি পদ্ধতিতে চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে পরিবার প্রতি খাদ্য বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ১-৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ৩০ কেজি চাল, ৩ লিটার ভোজ্য তেল ও ৯ কেজি ডাল, ৪-৭ সদস্যভুক্ত পরিবারের জন্য ৬০ কেজি চাল, ৬ লিটার ভোজ্য তেল ও ১৮ কেজি ডাল এবং ৮ এর বেশি সদস্যভুক্ত পরিবারের জন্য ১২০ কেজি চাল, ১২ লিটার ভোজ্য তেল ও ২৭ কেজি ডাল প্রদান করা হয়[১৬]। অন্যদিকে ই-ভাউচার পদ্ধতিতে রোহিঙ্গাদের জন্য মাসিক ৭৭০-৭৮০ টাকা[১৭] মূল্যের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেখানে প্রতি ব্যক্তি ১৯টি[১৮] খাদ্য তালিকা হতে তার পছন্দ মতো খাদ্য নিতে পারবে। বর্তমানে ই-ভাউচার পদ্ধতির আওতায় ৪০৪,৪৮৬ জন রোহিঙ্গা ১৮ প্রকারের খাদ্য পাচ্ছে[১৯]। খাদ্য রান্না এবং বনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ১,২৭,৮৫২টি সিলিন্ডার গ্যাস রোহিঙ্গাদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে[২০]। চার সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের জন্য একটি সিলিন্ডার দেওয়া হচ্ছে।

অপরদিকে মৃত্যুর হার প্রতিরোধ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে ক্যাম্পগুলোতে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সমন্বয় করে কক্সবাজার সিভিল সার্জনের কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হলো তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা, অনুপুষ্টি সম্পূরণ, নির্দিষ্ট সম্পূরক খাদ্য প্রকল্প, সাধারণ সম্পূরক খাদ্য প্রকল্প, ব্লাংকেট সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রোগ্রাম (বিএসএফপি) এবং পরামর্শ দানের মাধ্যমে যথাযথ মাতৃত্ব, নবজাতক ও শিশুদের খাদ্য প্রদান (এমআইওয়াইসিএফ) চর্চা[২১]। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঁচবছরের নিচে অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী এবং অন্যান্য অসহায় মানুষদের চিহ্নিতকরণ, চিকিৎসার জন্য প্রেরণ ও চিকিৎসা শেষে ফলোআপ করা হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ওপরের উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। একদিকে যেমন খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে আর্থিক অনুদান কমে গিয়েছে অপরদিকে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতি, নতুন রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ এবং আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তার ওপর চাপ বাড়ছে। এছাড়াও পরিবারগুলোর ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হওয়ার প্রবণতাও এক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পূর্বে নতুন পরিবার তৈরির মাধ্যমে বেশি পরিমাণ ত্রাণ নেওয়ার অভিযোগ থাকলেও বর্তমানে এ অভিযোগ নেই। বর্তমানে ছোট ছোট পরিবারের জন্য আলাদাভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। ফলে এ সকল নতুন পরিবারকে আলাদা খাদ্য সহায়তা প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ সদস্যদের তার পুরানো পরিবারের সাথে থেকে খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে হয়। এ কারণে অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক কলহ ও খাদ্য বন্টনে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

খাদ্য রান্না এবং বনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গাদের এলপিজি গ্যাস প্রদান করা হলেও তা এখনো সকল পরিবারের জন্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবার কোনো কোনো রোহিঙ্গা পরিবার প্রাপ্ত এলপিজি গ্যাস স্থানীয় বাজার, হোটেল ও দোকানে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। যে সকল পরিবার এলপিজি গ্যাসের আওতায় আসেনি এবং যারা এলপিজি গ্যাস স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে তাদের সকলেই জ্বালানি কাঠের চাহিদা পূরণে পার্শ্ববর্তী বনের ওপর নির্ভরশীল। কিছুক্ষেত্রে স্থানীয়রা পার্শ্ববর্তী বন থেকে কাঠ কেটে রোহিঙ্গাদের কাছে গোছাপ্রতি ৪০/৬০ টাকায় জ্বালানি কাঠ বিক্রি করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন কাটার কারণে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় অধিবাসী উভয়ের জন্য অনিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়া যা প্রকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি করবে এবং উভয় জনগোষ্ঠীতে এর প্রভাব পড়বে[২২]।

রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা তাদের ত্রাণের একাংশ বাজারে বিক্রি করে থাকে তারা মূলত খাদ্য বৈচিত্র্য রক্ষায় অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য বাধ্য হয়ে বিক্রি করে থাকে। উল্লেখ্য, স্ফিয়ার মানদণ্ড[২৩] অনুযায়ী দুর্যোগ কবলিতদের খাবার রান্নার জন্য মসলাসহ

---

[১৫] ISCG (22 October, 2019) *Rohingya Refugee Crisis: Joint Response Plan 2019 funding update*, Cox's Bazar, Bangladesh

[১৬] প্রাগুক্ত।

[১৭] আইএসসিজি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৯) '*রোহিঙ্গা মানবিক সংকট সংক্রান্ত: যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি*', পৃষ্ঠা-৩৩, কক্সবাজার, বাংলাদেশ

[১৮] আতপ চাল, মসুর ডাল, আয়োডিনযুক্ত লবন, ফর্টিফাইড সয়াবিল তেল (রুপচাদা পলিপ্যাক), ফর্টিফাইড সয়াবিল তেল (ফ্রেশ/তীর- পলিপ্যাক), চিনি, টাটকা কলমি শাক, টাটকা লাল শাক, আলু, পেয়াজ, মরিচ (কাচা, শুকনা, গুড়ো), ডিম, লেবু, ওয়াইএসপি, কুমড়া

[১৯] প্রাগুক্ত।

[২০] Relief Web (31 May, 2019) *Rohingya Refugee Camps Turn to LPG, Reforestation to Save Deplted Bangladesh Forest*; https://reliefweb.int/report/bangladesh/rohingya-refugee-camps-turn-lpg-reforestation-save-depleted-bangladesh-forests access on 26 September, 2019

[২১] প্রাগুক্ত।

[২২] প্রাগুক্ত।

[২৩] মানবিক সহায়তার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য স্ফিয়ার প্রকল্প এবং এর হ্যান্ডবুক এর পরিচিতি রয়েছে যেখানে স্ফিয়ারের ন্যূনতম মান কিভাবে অর্জন করবে তাও আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি মানবিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্ফিয়ার এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল দুর্যোগকালীন কার্যক্রমের মান উন্নয়ন করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পাওয়ার সুযোগ আছে তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে[২৪]। বর্তমানে খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে ই-ভাউচারের আওতায় মোট জনগোষ্ঠীর ২.৯% (২৬,৫৪২ জন) সহায়তা পাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গার খাদ্য বৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজ খরচে কিনে খেতে হয়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহে ৫-২৬ মাস বয়সি শিশুদের মধ্যে ৭.৩% শিশু ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য পায়[২৫]। অপরদিকে নিয়মিত ত্রাণের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া ও নিম্নমানের পণ্য সামগ্রী বিতরণের অভিযোগ রয়েছে। বিতরণকৃত চালের বস্তায় ৩০ কেজি লেখা থাকলেও অধিকাংশক্ষেত্রে ২৬-২৮ কেজি চাল দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সরকারি খাদ্য গুদামের কর্মকর্তাদের একাংশ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চাল কম দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ডাল ও চালে পোকা ও পাথর থাকা, জমাট বাঁধা চাল দেওয়া এবং নিম্নমানের তেল দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নিম্নমানের তেল ব্যবহারের কারণে অনেকসময় তারা বিভিন্ন পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ত্রাণ কেন্দ্রগুলোতে চালের বস্তা বা প্রদেয় সামগ্রী পরিমাপের জন্য কোনো ওজন পরিমাপক যন্ত্র নেই।

স্ফিয়ার মানদণ্ড অনুযায়ী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পরিকল্পনা ও নিরূপণের সময় খাদ্য উপকরণগুলোর গ্রহণযোগ্যতা, পরিচিতি ও যথার্থতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করা এবং সেই অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে[২৬]। কিন্তু এক্ষেত্রে এ বিষয়টি অনেকাংশে নিশ্চিত করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বুটের ডাল প্রদান করা হয় অথচ তাদের এ ডাল খাওয়ার সংস্কৃতি ও অভ্যাস নাই, বরং তারা মুগ ডাল খেয়ে অভ্যস্ত। এ কারণে অধিকাংশক্ষেত্রে তারা এ ডাল বাজারে বিক্রি করে দেয়। এছাড়া পরিবারে স্থায়ীভাবে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক অথবা বিপদাপন্নদের জন্য যথার্থ পুষ্টিকর খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা নিশ্চিত করার নিয়ম রয়েছে[২৭]। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলো অনেকক্ষেত্রে দূরবর্তী হওয়ায় প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীরা সশরীরে ত্রাণ বিতরণকেন্দ্রে ত্রাণ নিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ কারণে অনেকক্ষেত্রে তাদের অন্যের সহযোগিতা নিতে হয় এবং এ সহযোগিতার জন্য ত্রাণের একাংশ প্রদান করতে হয়।

৩.২ *শিক্ষা*

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ইউনিসেফ ও ইউএনএইচসিআর-এর তত্ত্বাবধায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। পাঠ্যসূচি প্রস্তুত, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং নতুন শিক্ষণ কাঠামো উন্নয়নে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে ইউনিসেফ।[২৮] বিভিন্ন সংস্থার লার্নিং সেন্টারের সংখ্যা ৪,৮১১টি[২৯], যেখানে অংশগ্রহণকারী ৫-১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে ৫৭% মেয়ে এবং ৬০% ছেলে[৩০]। নিয়োগকৃত রোহিঙ্গা শিক্ষকদের মধ্যে ৬০% পুরুষ এবং বাঙ্গালী শিক্ষকদের ভিতর ৬০% নারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে[৩১]। লার্নিং সেন্টারগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজি, গণিত ও বার্মিজ ভাষার ওপর পাঠদান করা হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা সেবার জন্য ২০১৯ সালে প্রয়োজন ছিলো ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে যা প্রয়োজনের ৫০ শতাংশ।

ক্যাম্পগুলোতে কোনো অনুমোদিত পাঠ্যক্রম না থাকায় বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদান করে। এক্ষেত্রে লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক বা শিক্ষণ কাঠামো তৈরিতে বিলম্ব লক্ষ করা যায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত ১-২ নির্দেশনা অর্থাৎ শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের সর্বনিম্ন শ্রেণির অনুমোদন পেয়েছে এবং ৩-৫ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে[৩২]। রোহিঙ্গা শিক্ষকদের একাংশের মতে, "কোনো অনুমোদিত শিক্ষাসূচি না থাকায় তারা বুঝতে পারে না কার জন্য কী ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে বা শিখাবে অর্থাৎ সবাইকে একই বিষয় পড়াতে হয় এবং অনেক শিশু কিশোর এ বিষয়গুলো আগেই মিয়ানমার থাকার সময় শিখে এসেছে, ফলে এগুলো শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে"[৩৩]। ক্যাম্পে প্রায় ১,১৭০০০ রোহিঙ্গা কিশোর রয়েছে, যার ৩-১৪ বছরের ৩৯% শিশু এবং ১৫-২৪ বছরের ৯৭% কিশোর-কিশোরী শিক্ষা গ্রহণ করছে না[৩৪]। একটি গবেষণায় দেখা যায়, এদের জন্য কোনো শিক্ষাপদ্ধতি না থাকায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে[৩৫]।

---

[২৪] প্রাগুক্ত

[২৫] প্রাগুক্ত

[২৬] স্ফিয়ার প্রজেক্ট (২০১১) *'মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়াদানের ন্যূনতম মান'* , পৃষ্ঠা ১৩১, ফাউন্ডেশন ফর ডিজাস্টার ফোরাম,ঢাকা, বাংলাদেশ

[২৭] স্ফিয়ার প্রজেক্ট (২০১১) *'মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়াদানের ন্যূনতম মান'* , পৃষ্ঠা ১৫৯, ফাউন্ডেশন ফর ডিজাস্টার ফোরাম,ঢাকা, বাংলাদেশ

[২৮] প্রাগুক্ত

[২৯] Unicef (August 2019) *' Future in the balance: Building hope for a Generation of Rohingya Children',* Child alert, Coxs Bazar

[৩০] *Joint education Sector Needs Assesment (JENA),* Coxs Bazar, Bangladesh, Geneva Reach initiative (June 2018)

[৩১] প্রাগুক্ত

[৩২] ISCG (June, 2019), *'Situation Report Rohingya Crisis'*, Cox's Bazar, Bangladesh

[৩৩] প্রাগুক্ত

[৩৪] আইএসসিজি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৯) *'রোহিঙ্গা মানবিক সংকট সংক্রান্ত: যৌথ সাড়াদান কর্মসূচি'*, পৃষ্ঠা-৩৫, কক্সবাজার, বাংলাদেশ

[৩৫] প্রাগুক্ত

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ না থাকায় কিশোর ও যুবকদের মধ্যে ক্যাম্পের বাইরে কাজ করা এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার সরকারও কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুমোদন দিচ্ছে না। অথচ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে শিক্ষার অধিকারকে একটি মূল বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে[৩৬]। শিক্ষা মানব অধিকারের একটি মূল নীতি হিসেবে ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র[৩৭] ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সম্মেলনে নজরে আনা হয়[৩৮]। বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও উভয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ফলে রোহিঙ্গাদের শিক্ষার অধিকার প্রদান না করে চুক্তি লঙ্ঘণ করছে বলে মুখ্য তথ্যদাতাদের একাংশ মনে করেন।

গবেষণা দলের পর্যবেক্ষণে শিশুদের ভিতর পাঠ গ্রহণের আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু অভিষ্ট জনসংখ্যার তুলনায় লার্নিং সেন্টার তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে সিআইসিদের একাংশের মতে, অনেক ক্যাম্পে লার্নিং সেন্টার তৈরির জন্য উন্নয়ন সংস্থাসমূহ আবেদন করলেও জায়গার সংকুলান না হওয়ায় অনুমতি দেওয়া হয় না। এছাড়া লার্নিং সেন্টারগুলোর একাংশ নালা, ড্রেন এবং পাহাড়ের ওপরে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বর্ষাকালে ভারি বর্ষণে এসকল লার্নিং সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের ভিতর চাহিদা বিশ্লেষণে সমন্বয়ের ঘাটতিসহ কার্যকর পদ্ধতি অর্থাৎ অল্প জায়গায় বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে এসকল লার্নিং সেন্টারসমূহে পানি, টয়লেট ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব রয়েছে[৩৯]। অপরদিকে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের পর প্রথমদিকে অপরিকল্পিতভাবে লার্নিং সেন্টার তৈরি করার ফলে এগুলোর কাঠামোগত মান ভালো ছিলো না[৪০]। রোহিঙ্গা অভিভাবকের মতে আশ্রয়স্থান হতে লার্নিং সেন্টারের দূরত্ব বেশি, এবং লার্নিং সেন্টারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষকরে মেয়েদের নিরাপত্তার ঘাটতি বেশি বলে মনে করা হয়[৪১]। ৬-১৪ বছরের (৩২% মেয়েদের, ২৫% ছেলেদের ক্ষেত্রে) শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়টি জড়িত যা ১৫-১৮ বছরের শিশুদের তুলনায় বেশি (মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩২% ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮%)[৪২]। এছাড়া সামাজিক বাধা ও চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে অধিকাংশ রোহিঙ্গা অভিভাবক তাদের কিশোরী মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ পোষণ করে। স্ট্রাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপের সাম্প্রতিক (২০১৯) পরিকল্পনায় দেখা যায়, ৩-১৪ বছরের বছরের শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা উন্নতি করতে হলে আরও প্রায় ২০০০টি নতুন লার্নিং সেন্টারের প্রয়োজন এবং এর জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৬৮ একর জায়গার প্রয়োজন[৪৩]।

লার্নিং সেন্টারগুলোতে রোহিঙ্গা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। রোহিঙ্গাদের মধ্যে বার্মিজ ভাষা জানে এমন শিক্ষিত ব্যাক্তির অভাব আছে।[৪৪] অনেকসময় মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিদেরও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় যারা শিশু-কিশোরদের ভালোভাবে পড়াতে পারে না বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগে মাঝি ও উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের যোগসাজসে নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের অভিযোগ লক্ষণীয়। অপরদিকে স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের কারণে তহবিল শেষ হয়ে গেলে অনেক লার্নিং সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।

৩.৩ স্বাস্থ্য

রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সাতটি ফিল্ড হাসপাতাল ও ১৬২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান (১০টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৬টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার, ৬টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কক্সবাজার জেলা হাসপাতাল) রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের

---

[৩৬] ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে শিক্ষা মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত যা মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) (অনুচ্ছেদ ২৬) এবং শিশু অধিকার বিষয়ক জাতীসংঘের কনভেনশনে সংযুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যে কোনো দেশের জন্য তার সীমারেখার অভ্যন্তরে সকল শিশুকে তার জাতীগত পরিচয় যা হোক না কেনো বা শরণার্থী হলেও তার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। মানবাধিকার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সকল শিশুর বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের মতামত প্রদানের স্বাধীনতা রয়েছে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে (২১৭ এর **III)** রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

[৩৭] প্রাগুক্ত

[৩৮] প্রাগুক্ত

[৩৯] প্রাগুক্ত

[৪০] প্রাগুক্ত

[৪১] *Rohingya Influx Overview (RIO)*-April 2019, Coxs Bazar, Bangladesh.p 7.

[৪২] প্রাগুক্ত

[৪৩] প্রাগুক্ত

[৪৪] প্রাগুক্ত

চক্ষুসেবা প্রদানে অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় স্থানীয় বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতারে এর সাথে একটি চুক্তি সম্পদান করা হয়েছে।

২০১৯ সালে স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রয়োজন ছিলো ৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে যা চাহিদার তুলনায় মাত্র ৩৫ শতাংশ ।

স্বাস্থ্যসেবায় রোহিঙ্গাদের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ক্যাম্পসমূহে রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও রোগীর চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ করে দুর্গম বা দূরবর্তী ক্যাম্পে বসবাসরতদের চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেঁটে নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে একঘন্টারও বেশি সময় লেগে যায়।

ক্যাম্পসমূহে বৃষ্টির মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও ময়লা জমে যাওয়ায় পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। গবেষণায় তথ্যপ্রদানকারী প্রায় সকল রোহিঙ্গার পরিবারের কেউ না কেউ ডায়রিয়া, জ্বর ও কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ডিপথেরিয়া নির্মূল হওয়ার কাছাকাছি থাকলেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এর মহামারি ঝুঁকি লক্ষণীয়। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ডিপথেরিয়ায় ৮,৬৪১ জন আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যু হয় ৪৫ জনের।

ক্যাম্পগুলোতে নিবন্ধিত মোট এইচআইভি রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৬০০ জন[৪৫]। এইচআইভি আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশংকা থাকলেও এক্ষেত্রে কোনো স্ক্রীনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। মূলত কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ সদর হাসপাতালে গেলে রোগের লক্ষণ নিরুপণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষায় হঠাৎ এইচআইভি আক্রান্তদের চিহ্নিত করা যায়।

ক্যাম্পের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে ওষুধের সরবরাহ ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। এসব চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগ নির্নয় করার যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে এবং শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ওষুধের সবগুলো না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবস্থাপত্রে ৫টি ওষুধ দেওয়া হলে ওষুধ পাওয়া যায় ৩টি। আবার কিছুক্ষেত্রে যেকোনো অসুখের ক্ষেত্রে শুধু প্যারাসিটামল দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ব্যয়বহুল চিকিৎসা নিজ খরচে করাতে হয়। এছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে দালালের সহায়তা নিতে বাধ্য হওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভিতর অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। প্রতিদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গড়ে প্রায় ৮৫-৯০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে রোহিঙ্গা নারীদের মধ্যে পূর্বের তুলনায় স্বল্পমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য মতে (২০১৯), রোহিঙ্গাদের স্বল্পমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাত্রা ১৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬% উন্নীত হয়েছে[৪৬]।

৩.৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাত পরিচালনায় ইউনিসেফ, আইওএম ও ইউএনএইচসিআর[৪৭] এর তত্ত্বাবধায়নে ৩৮টি সংস্থার ২২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে[৪৮]। এ খাতের জন্য ২০১৯ সালে অর্থের প্রয়োজন ছিল ১৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা চাহিদার মাত্র ২২%[৪৯]।

ক্যাম্পগুলোতে পানি সরবরাহ সেবায় ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বর্তমানে ক্যাম্পের ভেতরের বিভিন্ন পয়েন্টে অগভীর নলকূপ ও হস্তচালিত নলকূপ নষ্ট। এছাড়া বেশিরভাগ ক্যাম্পেই নলকূপগুলো অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করার ফলে খাবার পানি অনেকদূর হতে সংগ্রহ করতে হয়। একটি গবেষণায় পানি সংগ্রহে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে জরিপকৃত ব্যক্তিদের ৫৬% পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে লাইনে দাঁড়ানো, ৪৭.২% পানির উৎসের স্বল্পতা, এবং ৪২.৮% পানির উৎস দূরবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫০]

---

[৪৫] কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়, ২২ আগষ্ট, ২০১৯

[৪৬] প্রাগুক্ত।

[৪৭] প্রাগুক্ত।

[৪৮] প্রাগুক্ত।

[৪৯] ISCG (October, 2019) *Rohingya Humanitarian Crisis: Joint Response Plan, funding update* , Cox's Bazar, Bangladesh

[৫০] *Rohingya Influx Overview (RIO)*-April 2019, Coxs Bazar, Bangladesh.p 7.

অধিকাংশ ক্যাম্পে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। কিছু ক্যাম্পে পর্যাপ্ত টয়লেট নেই। কিছুক্ষেত্রে টয়লেটের পাশে পানি সরবরাহ না থাকায় টয়লেট ব্যবহারে অনেক দূর থেকে পানি আনতে হয়। একটি গবেষণায় এক্ষেত্রে ৪৯% মেয়ে এবং ৪০% মহিলা ল্যাট্রিন সুবিধা এবং ৪০% মেয়ে এবং ৩৪% মহিলা গোসলের স্থানসমূহ অনিরাপদ বোধ করছে।[৫১] নিয়ম অনুযায়ী সাইট ম্যানেজমেন্ট অফিস টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকলেও তা করে না। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। আবার রোহিঙ্গারা নিজ থেকে ঠিক করলে বা পরিষ্কার করলে তার ছবি তুলে নিজেরা ঠিক করেছে বলে দাবি করার অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে তৈরি করা বেশিরভাগ টয়লেট এখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত টয়লেটগুলো মাঝি বা স্থানীয় প্রভাবশালীরা দখল করে ঘর বা দোকান বানিয়ে অন্যদের কাছে ভাড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ক্যাম্পগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশন ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপরিকল্পিত ও নাজুক হওয়ায় বর্ষাকালে ভারী বর্ষণে নালা ও নর্দমার পানি উপচে পড়ে। এর ফলে ক্যাম্পের রাস্তাঘাটে পানি জমে থাকে এবং হাঁটাচলায় সমস্যা হয়।

৩.৫ *আশ্রয়*

২০১৯ সালে আশ্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য ১২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন থাকলেও অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা চাহিদাকৃত অর্থের ২৬%। প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্ত অর্থ কম হওয়ায় এ খাতে কর্মসূচি পরিচালনা করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত।

ক্যাম্পগুলো দ্রুত ও অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার কারণে নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিজনের জন্য ২০ ঘনমিটার জায়গা প্রয়োজন কিন্তু রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিজনের জন্য ১০-১৩ ঘনমিটার জায়গা রয়েছে, যা বসবাসের জন্য অস্বাস্থ্যকর ও অনুপযোগী। এছাড়া ঢালু ও বন্যাপ্রবণ নিচু জমিতে গড়ে উঠা ক্যাম্পগুলোতে মৌলিক চাহিদা পূরণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি প্রশমনের জন্য যেসব অপরিহার্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে তার অবস্থা বেশ নাজুক।[৫২] কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিকল্পন গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ: উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ক্যাম্পগুলোতে ঘূর্ণিঝড় বা পাহাড় ধসের বিপর্যয়ের সময়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য কোনো আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয় নি। অপরদিকে আশ্রয়স্থল মেরামতের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। অধিকাংশক্ষেত্রে ঘর তৈরি করার জন্য দেওয়া বাঁশ ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো মেরামত করে দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা না করার অভিযোগ রয়েছে।

৩.৬ *নিরাপত্তা ও সুরক্ষা*

২০১৯ সালে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদার পরিমাণ ছিল ৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে ৩৪ মিলিয়ন ডলার যা মোট চাহিদার ৩৯%[৫৩]। এ খাত পরিচালনায় চাহিদা অনুযায়ী তহবিল না পাওয়ায় সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে।[৫৪]

ব্যাপকহারে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর এবং সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পরবর্তী সময়ে রোহিঙ্গাদের পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে বিধবা, এতিম, বয়স্ক, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের অসহায়ত্ব বেড়েছে। এছাড়া যুবকদের সুনির্দিষ্ট (শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান) চাহিদা রয়েছে এবং তারা অন্যান্য বয়সের তুলনায় বেশি সুরক্ষা ঝুঁকির সম্মুখীন হয় কারণ তারা প্রায়শই তাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয় না। এছাড়া তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় ক্যাম্পের ভিতর অলস সময় কাটাতে হয়। ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে শিশুর হার ৫৫%[৫৫]। এসব শিশুরা মানসিক সমস্যা, অবহেলা, নির্যাতন, যৌন সহিংসতা, শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম ও পাচারসহ বিভিন্ন নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ঘাটতি বিদ্যমান। দিনের বেলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও রাতের বেলা ক্যাম্পের ভেতর নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। ৩৪টি ক্যাম্পের মধ্যে দুইটি নিবন্ধিত ক্যাম্পে সিআইসি'র অধীনে নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে কিন্তু নতুন স্থাপিত ৩২টি ক্যাম্পে সিআইসি'র অধীনে নিরাপত্তা কর্মী নেই। এসব ক্যাম্পে নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে সিআইসি ও অ্যাসিস্টেন্ট সিআইসি রাতের বেলা ক্যাম্পে অবস্থান করে না। ফলে নিবন্ধিত দুইটি ক্যাম্পের তুলনায় বাকিগুলোতে অপরাধ বেশি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ক্যাম্পের ভেতরে যেসব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো শুধু সেখানে যৌথ বাহিনী টহল দেয়

[৫১] প্রাগুক্ত।
[৫২] প্রাগুক্ত।
[৫৩] প্রাগুক্ত।
[৫৪] প্রাগুক্ত।
[৫৫] প্রাগুক্ত।

বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, যৌথবাহিনী উখিয়ায় অবস্থিত ২৬টি ক্যাম্পে ৮টি দল এবং টেকনাফের ৮টি ক্যাম্পে ২টি দলে ভাগ হয়ে টহল দেয়।

মিয়ানমারে অবস্থানকালে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও শিক্ষার সংকট এবং স্থানান্তরজনিত অনিশ্চয়তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনোসামাজিক অসহায়ত্ব, সহিংস মনোভাব ও অপরাধ প্রবণতা তৈরি করেছে। ফলে ক্যাম্পগুলোতে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, মাদকপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ ঘটছে। কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে মোট মামলা হয়েছে ৪৭১টি, এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ১,০৮৮ জন। ক্যাম্পগুলোতে পারিবারিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির ঘটনা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে এতিম শিশু ও অল্পবয়সী মেয়েদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় সাতটি সন্ত্রাসী গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী গ্রুপের হুমকির কারণে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা নারীদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। ক্যাম্পভিত্তিক দালাল চক্রের সহায়তায় রোহিঙ্গাদের পাচারের অভিযোগ রয়েছে। পাচারের ক্ষেত্রে সমুদ্র পথ হিসেবে মহেশখালির সোনাদিয়া, জেটি ঘাট, নাজিরা টেক, কক্সবাজার পৌরসভার সোহলান্দি ঘাট, সদরের চৌফলন্দি ঘাট এবং টেকনাফের বাহারছড়া শিলখালি পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত যুবতী নারীদের পাচারের সংখ্যা বেশি। পাচারের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দালালদের ১০-২০ হাজার টাকা দিতে হয় এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পর দেড়-দুই লক্ষ টাকা দিতে হয়। অপরদিকে ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তাদের একাংশ স্থানীয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে কক্সবাজার জেলার স্থানীয় জনগণের সাথে মূলস্রোতে মেশার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নিজ ক্যাম্পের বাইরে চলাচল সীমিত করা হলেও ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। এক্ষেত্রে স্থানীয় টমটম ড্রাইভারদের সহায়তায় ২৫০-৩০০ টাকার বিনিময়ে মরিচ্যা চেকপোস্ট এড়িয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করার অভিযোগ রয়েছে।

অধ্যায় চার

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৪.১ সমন্বয়ের ঘাটতি

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। সরকারি অংশীজনের মধ্যে এনজিও কার্যক্রমের তদারকিতে বিশেষত কার্যক্রমের অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান এবং ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস এবং আরআরআরসি কার্যালয় একই ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে এনজিওগুলোর প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি এবং নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। আবার ডিসি অফিস ও আরআরআরসি'র মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পের ভেতরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণায় অস্পষ্টতা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এবং আরআরআরসি'র সমন্বয়ের এবং দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-ইন-চার্জ-এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সমাবেশের আবেদনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে (আরআরআরসি কমিশনার ও ডিসি অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। অপরদিকে আরআরআরসি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, তাঁরা বৃহস্পতিবার ২২ আগষ্ট রাত পর্যন্ত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর দু'দিন ছুটি থাকায় (শুক্রবার ও শনিবার) সমাবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদনের বিষয়টি পর্যালোচনা করার সময় পাননি। ফলে ২৫ আগস্ট (রোববার) অনুমোদনহীন রোহিঙ্গা সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবার এ প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভাষ্য হচ্ছে "সমাবেশের ব্যাপারে কেউ জেলা প্রশাসনকে জানায় নি কিন্তু তারা (আরআরআরসি) ঠিকই জানতো। আমার জেলায় একটা বিড়াল মারা গেলেও তা দেখা আমার দায়িত্ব, কিন্তু অনেকসময় আমাকে না জানিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলা হয়।" উল্লেখ্য রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় আরআরআরসি'র বিভিন্ন সমন্বয় সভায় অধিকাংশক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধির উপস্থিত না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আরআরআরসি'র একজন কর্মকর্তার মতে, "সমন্বয়ের ঘাটতিতো আছে। আমাদের কোনো সভায় জেলাপ্রশাসকের কোনো প্রতিনিধি আসে না।"

অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্প পর্যায়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাজের পুনরাবৃত্তি ও সমন্বয়হীনতার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকা সত্ত্বেও একটি ক্যাম্পে দুই'টি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লার্নিং সেন্টার তৈরিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে উক্ত ক্যাম্পে ডোবা, নালা ও পাহাড়ের ওপর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে লার্নিং সেন্টার স্থাপন হয়েছে। অথচ যেসব ক্যাম্পের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় সেখানে লার্নিং সেন্টারের অপ্রতুলতা রয়েছে।

৪.২ ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি

জনবলের ঘাটতি

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান। মাত্র ১২ জন সিআইসি ও ২২ জন অ্যাসিস্টেন্ট সিআইসিসহ মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা দ্বারা প্রায় দশ লক্ষ জনগোষ্ঠীর বসবাসরত ৩৪টি ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে। জনবল ঘাটতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষে একজন সিআইসিকে একাধিক ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সার্বিকভাবে এ কারণে ক্যাম্পের তদারকি ব্যাহত হয় এবং ক্যাম্প পরিচালনা ও ত্রাণ বণ্টনে 'মাঝি'দের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়, ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ক্যাম্প পরিচালনায় সিআইসিদের দক্ষতা ও মানবিক নীতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ঘাটতি

শরণার্থীদের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সমন্বয় রেখে 'মানবিক নীতি'[৫৬] মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধিকন্তু, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থায় পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ সমন্বয় করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় বিশেষত 'মানবিক নীতি' বিষয়ে সিআইসিদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। এর ফলে সিআইসি ও তার সহযোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবিক নীতি মেনে না চলার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের

---

[৫৬] মানবিক নীতিগুলি মূলত সেই সকল মূলনীতি থেকে উদ্ভূত যা দীর্ঘদিন ধরে রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আন্তর্জাতিক কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় গাইডলাইন হিসেবে অনুসরিত হচ্ছে। এগুলো হলো মানবিকতা, ন্যয়, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবামূলক সেবা, ঐক্য এবং সর্বজনীনতা। রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের ২০ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন দ্বারা ১৯৬৫ সালে ভিয়েনায় মৌলিক নীতিগুলি ঘোষণা করা হয়। OCHA (June 2012), ***'OCHA on message:Humanitarian Principle'***, https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf

সাথে খারাপ আচরণ এবং শারীরিক লাঞ্ছনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য মাত্র ৯ জন সিআইসিকে মানবিক নীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩ আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি

বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত একবারও প্রয়োজনের বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ প্রয়োজনের বিপরীতে যথাক্রমে ৭৩%, ৬৯% ও ৪২%। বিভিন্ন খাতভিত্তিক মৌলিক চাহিদা পূরণে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের ফলে সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ কমে গেলে অর্থ সহায়তাও কমে যাওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্পগুলোতে মানবিক ত্রাণ কর্মসূচি সংকুচিত হয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অর্থায়ন কমে গেলে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপর বর্তাবে যা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ ৪৪৩.৩০ মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮%। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কিনা সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২.৫ মিলিয়ন ডলার। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়সহ সামগ্রিকভাবে কোনো আর্থিক প্রাক্কলন এবং কৌশলগত কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। ফলে রোহিঙ্গা সংকটের কারণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি তৈরিসহ দীর্ঘমেয়াদে সংকট নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ৬: মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় বছরভিত্তিক আর্থিক প্রয়োজন ও প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন ডলার)

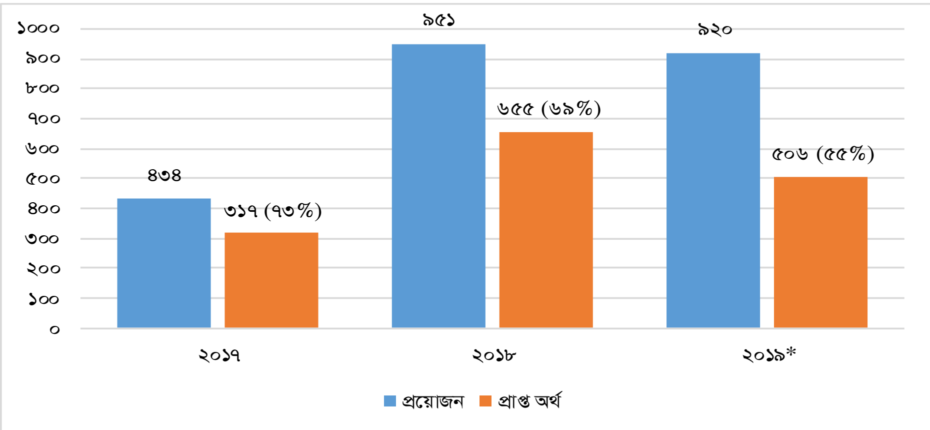

** ২০১৯ সালের প্রাপ্ত অর্থ ২২ অক্টেবর পর্যন্ত*

চিত্র ৭: ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মৌলিক চাহিদার খাতভিত্তিক আর্থিক প্রয়োজন ও প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন ডলার)

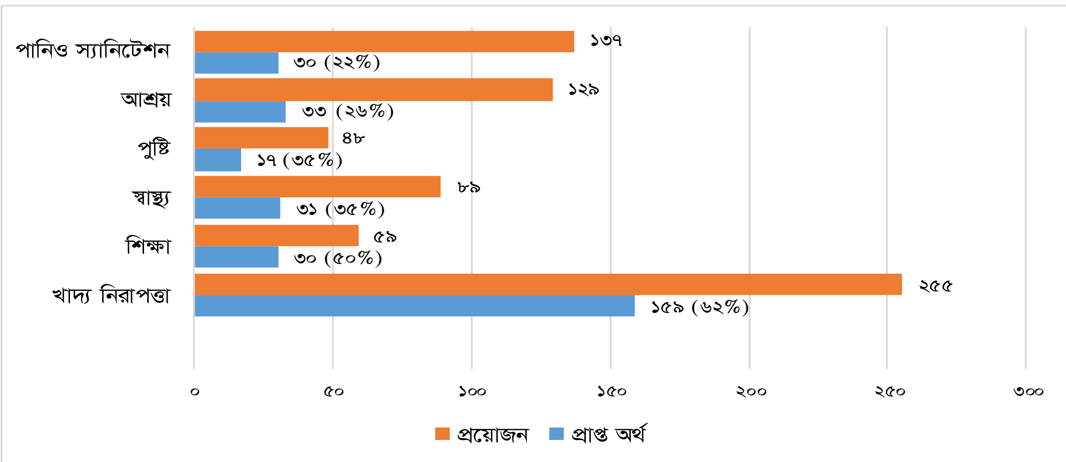

৪.৪ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ

এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্প পরিচালনায় এনজিও ব্যুরোর পক্ষ থেকে জবাবদিহি কাঠামো লক্ষণীয়। তবে অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে (কর্মসূচি বাস্তবায়নে) বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। অপরদিকে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ তাদের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি কাঠামো নেই। এছাড়া তাদের অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত (পরিচালন ব্যয়, কর্মসূচি ব্যয়) সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার এফডি-৭ এর আওতায় পরিচালিত কর্মসূচির ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জটিল ব্যবস্থা থাকলেও জাতিসংঘ ও এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থেকে বিতরণকৃত ত্রাণ যাচাইয়ে কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া এফডি-৭ এর আওতায় যেকোনো প্রকল্প প্রস্তাবনায় মোট অনুদানের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করার নিয়ম থাকলেও তা অনুসরণে ঘাটতির পাশাপাশি তা কিভাবে অনুসরণ করা হবে তার কোনো নির্দেশনা বা কাঠামো নেই।

অপরদিকে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিও'র একাংশের পরিচালন ব্যয় তাদের কর্মসূচির ব্যয়ের তুলনায় বেশি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গবেষণায় একটি আন্তর্জাতিক এনজিও'র প্রকৃত পরিচালন ব্যয় ৮২% এবং মানবিক সহায়তায় ব্যয় ১৮%[৫৭] উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের সাতটি সংস্থার প্রদত্ত তথ্য (২০১৭-১৯) অনুযায়ী, সর্বোচ্চ পরিচালন ব্যয় ইউএন উইমেন (৩২.৬%) ও সর্বনিম্ন জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (৩.০%)। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলোর প্রদত্ত কর্মসূচী ব্যয়ের মধ্যে তাদের অনুদানে পরিচালিত এনজিওসমূহের পরিচালন ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচীর পরিচালন ব্যয়ের হারের সঠিক হিসাব শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক করা সম্ভব। তবে তা অবশ্যই নিম্নে প্রদত্ত হারের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি।

সারণি ৩: রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় (২০১৭-২০১৯) জাতিসংঘের ৭টি অঙ্গসংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরিচালন ব্যয় ও কর্মসূচি ব্যয়ের হার

জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থার নাম	পরিচালন ব্যয় (%)	কর্মসূচি ব্যয় (%)
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)	২৫.৯৮	৭৪.০২
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)	১৪.৭	৮৫.৩
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)	১০.৩	৮৯.৭
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)	১৮.০	৮২.০
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)	৩.০	৯৭.০
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭.০	৮৩.০
ইউএন উইমেন (UN WOMEN)	৩২.৬	৬৭.৫

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়, ৩০ অক্টোবর ২০১৯, ঢাকা

এছাড়া ক্যাম্প পর্যায়ে এনজিওগুলোর চলমান কর্মসূচির তালিকা ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ক্যাম্প প্রশাসনকে অবহিত করার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো আন্তর্জাতিক এনজিও কর্তৃক তা প্রদান না করা ও এক্ষেত্রে অসহযোগিতার মনোভাব রয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে চ্যালেঞ্জ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ক্যাম্পে 'কমপ্লেইন্ট ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু থাকলেও অধিকাংশ রোহিঙ্গা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। এছাড়া সিআইসি অফিসে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা রূঢ় আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সার্বিকভাবে ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচারণার ঘাটতি ও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংবেদনশীলতার ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির (মাঝি) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যা অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করে। অপরদিকে মানবিক সহায়তার কার্যক্রম ও কর্মসূচি সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা (যেমন অভিযোগ বাক্স) লক্ষ করা যায় নি।

[৫৭] Localization of aid transparency in Bangladesh, Transparency, Grand Bargain C-4C and solidarity approach, COAST, Dhaka, 2018

৪.৫ অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি অংশীজন

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন দাবির অভিযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ভাষ্য অনুযায়ী, দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ সঠিক নয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রকল্প যাচাই বাছাইয়ে যৌক্তিক সময় নেয়া হয়। এনজিওসমূহ প্রকল্প দাখিলের পর যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সঠিক প্রতীয়মান হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহাপরিচালক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এনজিও কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প দাখিল, দাখিলকৃত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আইটেমের সাথে জেলা প্রশাসন ও আরআরআরসি কর্তৃক প্রেরিত তালিকার গরমিল, ইতোপূর্বে সম্পাদিত প্রকল্পে আরোপিত শর্ত মোতাবেক চাহিত প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট, প্রত্যয়ন পত্র, সমাপনী প্রতিবেদন, আরআরসি এবং ডিসি কক্সবাজারের নিকট দাখিলকৃত এফডি-৭ এর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র) ইত্যাদি দাখিল না করা এবং বাজেটে অসমাঞ্জস্যতা।

প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ প্রকল্প প্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২০-৫০ হাজার টাকা ও জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ ৫০-৭০ হাজার টাকা আদায় করে। এছাড়া জেলা প্রশাসক ও ইউএনও কার্যালয়ের সংস্কার এবং একটি স্থানীয় অটিস্টিক বিদ্যালয়ে সহযোগিতার নামে সংস্থাগুলোকে টাকা দিতে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। আবার ক্যাম্পে কাজ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন/ ছাড়পত্র পেতে সিআইসি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত টাকা ও অনৈতিক সুবিধা, যেমন বিমানের টিকিট, আত্মীয়-স্বজনের কেউ বেড়াতে আসলে গাড়ি ও হোটেল সুবিধা ইত্যাদি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন পেতে কমপক্ষে ৭-১৫ দিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাসেরও অধিক সময়ক্ষেপণের অভিযোগ পাওয়া যায়।

ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সময়ক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ডিসি অফিসের সংশ্লিষ্ট কমিটির একাংশ নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ত্রাণের মালবাহী গাড়িপ্রতি নিয়মবহির্ভূতভাবে ২,৫০০-৩,০০০ টাকা আদায় করে, এবং না দিলে ৫-১৫ দিন সময়ক্ষেপণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া যেসব সংস্থা ঘুষ দেয় তাদের ক্ষেত্রে মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে শিথিলতার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য গৃহীত নমুনা ফেরত দেওয়া হয় না এবং প্রায়ই নমুনার সংখ্যা জোর করে বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সিআইসিদের একাংশ এনজিওদের কার্যক্রম তদারকিতে বিশেষত কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে প্রতি কর্মসূচি বাবদ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২,০০০-৫,০০০ টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই টাকা দিতে কোনো সংস্থা অপারগ হলে পরবর্তীতে তাদের কাজে অসহযোগিতা করার অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারি অংশীজন

ক্যাম্প পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর একাংশের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন, আশ্রয় ঘর নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, লার্নিং সেন্টার স্থাপনসহ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) বাস্তবায়নে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার, কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ না করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাদের একাংশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত 'এনজিওগুলোর কর্মপরিধি' লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। যেমন: নিয়ম ভেঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে কাজের সুযোগ ও চাকরি দেয়া, মানবিক সহায়তার বাইরে প্রত্যাবাসনবিরোধী ভূমিকা রাখা, রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে সহায়তা ও টি শার্ট বিতরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া, প্রকল্পে অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিতরণ, রোহিঙ্গাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণের অভিযোগ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে সহায়তা ও টি শার্ট বিতরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দু'টি আন্তর্জাতিক এনজিও'র কার্যক্রম বন্ধ করেছে ও তাদের ব্যাংক হিসাব সাময়িক স্থগিত করেছে।[৫৮]

অপরদিকে বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তিতে 'মাঝি'দের বিরুদ্ধে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ৫০০-১০০০ টাকা আদায় ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া 'মাঝি'দের দ্বারা অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে যেকোনো বিচার-সালিশের মীমাংসার জন্য মাঝিদের টাকা ও ত্রাণের অংশ দিতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ টাকার পরিমাণ ২,০০০-৩,০০০ টাকা।

[৫৮] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, অক্টোবর, ২০১৯

সারণি ৪: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত ও পরিমাণ

খাত/ইস্যু	টাকার পরিমাণ	জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
এফডি-৭ অনুমোদন	সুনির্দিষ্ট করা যায়নি	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাই	২,৫০০-৩,০০০ (গাড়ি প্রতি)	ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট কমিটির একাংশ
প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র	২০,০০০-৫০,০০০	ইউএনও অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	৫০,০০০-৭০,০০০	ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	২০,০০০-২৫০০০ (ক্ষেত্রবিশেষে)	সিআইসি অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া	২৫০-৩০০	দালাল ও 'টমটম' ড্রাইভার
মানব পাচার	১০,০০০-২০,০০০ (প্রাথমিক) ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ (পৌছানোর পর)	দালাল
বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তি	৫০০-১,০০০	মাঝি
ক্যাম্পভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি	২,০০০-৩,০০০	মাঝি

অধ্যায়: পাঁচ

প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ ও বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি

৫.১ প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ

২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকটের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকার মানবিক দিক বিবেচনায় রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় দানের সিদ্ধান্ত নেয়[৫৯]। এর পাশাপাশি সংকট মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংকট সমাধানে পাঁচ দফা প্রস্তাব রেখেছিলেন। উক্ত প্রস্তাবে রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করাসহ তাদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।[৬০] পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর 'অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিটার্ন অব ডিসপ্লেসড পার্সন্স ফ্রম রাখাইন স্টেট' ও ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ৩০ দফা 'ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর এবং ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা সম্ভব হয় নি।

রোহিঙ্গা সংকট উৎপত্তির মূল কারণ মিয়ানমার সরকারের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিতে ব্যর্থতা। ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক দায়-দায়িত্বও মিয়ানমার সরকারের ওপর বর্তায়। এক্ষেত্রে মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ অর্থাৎ প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রত্যাবাসনের আস্থা সৃষ্টি হয়নি। অপরদিকে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীজনের ভূমিকার ঘাটতি রয়েছে । রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে চীন, ভারত ও জাপানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি দেশ বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ সম্পর্কিত কারণে এই তিনটি দেশই মিয়ানমারের পক্ষে ভূমিকা পালন করে, ফলে এ সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি কার্যত বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া উল্লিখিত প্রত্যাবাসন চুক্তিটি দ্বিপক্ষীয় হওয়ায় এবং এর সাথে তৃতীয় কোনো দেশ বা পক্ষের আনুষ্ঠানিক যুক্ততা না থাকায় এর আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি বা ভিত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ সংশ্লিষ্টদের একাংশের অভিযোগ রয়েছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রাখাইনে 'নিরাপত্তা বলয়" গঠন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছাড়াই দ্বিপক্ষীয় চুক্তিটি করার ফলে চুক্তির ভিত্তি আরও দুর্বল হয়েছে। অপরদিকে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা পরিবারের তালিকা তৈরি ও যৌথ যাচাইয়ের কাজে বিলম্ব হওয়া লক্ষণীয়। উল্লেখ্য ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় যৌথ যাচাইয়ের কাজ ২০১৮ সালের ২৪ জুন শুরু হয়, কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৬,৬০,৮৮৭ জনের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

৫.২ রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের ঝুঁকি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তা/রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রভাব ও ঝুঁকি বিদ্যমান।

৫.২.১ অর্থনৈতিক ঝুঁকি

রোহিঙ্গা শ্রমিকদের সহজলভ্যতার ফলে স্থানীয়দের (উখিয়া ও টেকনাফ) কাজের সুযোগ কমেছে। স্থানীয়রা বিভিন্ন কাজে (লবণ চাষ, চিংড়ি হ্যাচারি, চাষাবাদ) অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রোহিঙ্গাদের নিয়োজিত করছে। ফলে স্থানীয় দিনমজুরদের মজুরি গড়ে ১৫ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে[৬১]। এছাড়া স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন পণ্যের হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে শাকসব্জি থেকে শুরু করে মাছ মাংসের দাম ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে[৬২]। এছাড়া উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার সড়কগুলোতে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা, মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাদের যানবাহন এবং ত্রাণবাহী

[৫৯] বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে রোহিঙ্গা সংকটকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কিছু অংশ প্রনিধানযোগ্য: "দুঃখী মানবতার পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব....... আমরা যদি রোহিঙ্গাদের দুঃখের সময়ে পাশে না দাঁড়ায় তবে তা অমানবিক হবে" (১ অক্টোবর, ২০১৭); "বাংলাদেশ থেকে মায়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে মায়ানমার সরকারকে তাদের চাপ অব্যহত রাখতে হবে" (৫ জুন, ২০১৮)।

[৬০] রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ৫ দফা প্রস্তাব, দৈনিক যুগান্তর, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

[৬১] Rohingya crisis and the host community, Policy Research Institute (PRI), July 31, 2019

[৬২] প্রাগুক্ত

ট্রাকের অতিরিক্ত চলাচল ও চাপে যানজটসহ রাস্তাঘাটের ক্ষতি হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী (২০১৯), এ এলাকায় যানজট ২.৫ গুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে[৬৩]।

সারণি ৫: রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ (২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থ ছাড়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	খাত
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩.২০	কাঁটাতারের বেষ্টনী নির্মাণ
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২.৪৫	দু'টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪.৫৫	আইডি কার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১.৩২	এতিম শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯.৬৮	রাস্তা সংস্কার, নিরাপদ খাবার পানি এবং স্যানিটেশন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২২৬৫.৯১	আবাসন ও নিরাপত্তায় অবকাঠামো নির্মাণ
জননিরাপত্তা বিভাগ	.৯০৯৭	সেনা সদস্যদের দৈনিক ভাতা ও কন্টিনজেন্সি
মোট	**২৩০৮.০২**	

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩ নভেম্বর ২০১৯

উল্লেখ্য, রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের বড় অংশ জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসছে। ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের 'যৌথ সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৯২০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজনের বিপরীতে অক্টোবর পর্যন্ত ৩৯০ মিলিয়ন ডলার অনুদান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে (২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত) জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থার (ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফ, আইওএম, ইউএনএফপিএ, এফএও, ইউএন ওমেন, ডব্লিউএইচও) তহবিল প্রায় ৪৪৩.৩০ মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮ শতাংশ। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কিনা সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। অপরদিকে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ২,৩০৮.০২ কোটি টাকা।

মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, বাংলাদেশ সরকারকে রোহিঙ্গাদের জন্য এখন পর্যন্ত বড় ধরনের আর্থিক ব্যয় করতে হয় নি। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আংশিকও যদি বহন করতে হয় তাহলে তা বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২৫ লাখ ডলার। উল্লেখ্য বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি (২০১৮) ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চুক্তি অনুযায়ী প্রতিদিন ৩০০ জন রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বছরভিত্তিক খরচের একটি প্রাক্কলন করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ২০২৫ সাল পর্যন্ত হলে ৪৪৩.৩ কোটি মিলিয়ন ডলার, ২০২৬ সাল পর্যন্ত হলে ৫৮৯.৮ কোটি ডলার এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হলে ১০৪৫.৬ কোটি ডলার ব্যয় হবে[৬৪]। উল্লেখ্য এই ব্যয়ের মধ্যে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধু প্রত্যক্ষ ব্যয় বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.২.২ সামাজিক ঝুঁকি

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় স্থানীয় অধিবাসীরা মোট জনগোষ্ঠীর ৩৪.৮ শতাংশ ও রোহিঙ্গারা ৬৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[৬৫] এছাড়া পূর্বে উখিয়া এবং টেকনাফে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে ৭৯২ ও ৬৮০ জন যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে যথাক্রমে ৩,৪৬৮ ও ২,০৮৫ জন[৬৬]। ফলে এই দু'টি উপজেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কক্সবাজারে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা ১৩ লক্ষ,[৬৭] যাদের মধ্যে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা উভয়ই রয়েছে। আবার কক্সবাজার জেলার সরকারি হাসপাতালগুলোকে তাদের মোট চাহিদার ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে স্থানীয়

[৬৩] প্রাগুক্ত
[৬৪] Implications of the Rohingya crisis, Centre for Policy Dialogue (CPD), 2018
[৬৫] Crisis within the Crisis, COAST and CCNF, July 2018
[৬৬] প্রাগুক্ত
[৬৭] গ্লোবাল নেটওয়ার্ক এগেইনস্ট ফুড ক্রাইসিস, *গ্লোবাল রিপোর্ট*, ২০১৯।

জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এছাড়া এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে স্থানীয়দের মধ্যে এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা বিদ্যমান। রোহিঙ্গা সংকটের কারণে স্থানীয় প্রশাসনের ৫০ শতাংশ মানবসম্পদ ও লজিস্টিকস সহায়তা বর্তমানে রোহিঙ্গা সম্পর্কিত কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে কক্সবাজার জেলাসহ উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানে ও সেবাগ্রহীতাদের প্রাপ্ত সেবা পেতে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৫.২.৩ নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ঝুঁকি

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৯,১৭৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আটক করার এই সংখ্যা ছিল ৬৯০ জন। পুলিশ, পাসপোর্ট অফিস ও নির্বাচন কমিশনের কিছু অসাধু কর্মচারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দালালদের যোগসাজশে রোহিঙ্গাদের একাংশ জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট তৈরিসহ মোবাইল সিম কার্ড সংগ্রহ করছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে একজন রোহিঙ্গা নারীর ভুয়া এনআইডি নির্বাচন কমিশনের সার্ভারে ধরা পড়ে। এই ঘটনার মামলার তদন্ত করতে গিয়ে আরো ৫৪টি ভুয়া এনআইডি ধরা পড়ে। তদন্তে দেখা যায় চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় রোহিঙ্গাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হতো[৬৮]।

এছাড়া সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতির কারণে ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৫ লক্ষ রোহিঙ্গার হাতে মোবাইল ফোনের ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইন ভিত্তিক ১০টি ইউটিউব চ্যানেলে রোহিঙ্গাদের সক্রিয় থাকা লক্ষণীয়। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়াসহ নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে (টেকনাফ ও উখিয়া) সন্ত্রাসী বাহিনীর তৎপরতা লক্ষণীয়। ক্যাম্পগুলোতে প্রায় সাতটির মতো সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে। এইসব বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মুক্তিপণ না পেলে হত্যা করে লাশ গুম করা, ইয়াবা ও মানবপাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আধিপত্য বিস্তার, মাদক ব্যবসা, জমি দখল এবং বিভিন্ন কোন্দলের কারণে রোহিঙ্গাদের একাংশ কর্তৃক স্থানীয় অধিবাসী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হামলার শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট একজন রাজনৈতিক কর্মীকে নেতাকে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে একদল রোহিঙ্গা উক্ত ব্যক্তিকে তার বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং পাশের একটি পাহাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনার পরবর্তীতে ২৪ আগস্ট বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা একটি রোহিঙ্গা শিবিরে হামলা চালিয়ে অস্থায়ী ঘরবাড়ি ও এনজিও অফিসগুলোতে ভাঙচুর করে এবং টেকনাফ পৌরসভা থেকে লেদা পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ করে। একজন মুখ্য তথ্যদাতার মতে, "রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে অলস সময় কাটায়। তাদের হাতে কোনো কাজ নেই। তারা সপ্তাহে একদিন রেশন তোলে আর বাকি দিনগুলো তা বসে বসে খায়। হাতে কাজ না থাকায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হতাশা তৈরির পাশাপাশি দুষ্টবুদ্ধি খেলা করে। এছাড়া কোনো সম্প্রদায়কে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘদিন আটকে রাখা যায় না। এ কারণে তাদের মধ্যে হতাশা থেকে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা কাজ করে"।

২০১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) রোহিঙ্গা সংকটকে ঘিরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে[৬৯]। তাদের মতে ক্যাম্পগুলোতে জঙ্গিসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী ধরাছোঁয়ার বাইরে ও বেপরোয়াভাবে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠছে। এসব বিষয় নিষ্পত্তি করতে না পারলে তা দীর্ঘ মেয়াদে শরণার্থীদের (রোহিঙ্গা) ক্ষতির কারণ হবে এবং সম্ভবত এটি বাংলাদেশের এই অংশে অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতাকে উসকে দিতে পারে

৫.২.৪ পরিবেশগত ঝুঁকি

পরিবেশগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভূমিধস, বন উজাড়, খাবার পানির সংকট এবং বন্যপ্রাণীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্পে বসবাসরত পরিবারগুলোর দৈনন্দিন রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ৭৫০,০০০ কেজি কাঠ এবং বিভিন্ন গাছের শিকড় সংরক্ষিত বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলনে (২০১৯) কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ক্যাম্প নির্মাণের ফলে প্রায় ৬১৬৪ একর সংরক্ষিত বনভূমি যার স্থানীয় হিসাবে মূল্য প্রায় ২,৪২০ কোটি টাকা উজাড় হওয়ার পাশাপাশি প্রায় ১,৪০৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া হাতির চলাচলের পথ নষ্ট হওয়াসহ বন্যপ্রাণীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বন নিধনের এই ধারা অব্যাহত থাকলে কক্সবাজার জেলার পুরো বনাঞ্চলে হাতি এবং অন্যান্য জীবজন্তুদের আবাস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন প্রায়

---

[৬৮] ইসি'র কর্মচারীর সহায়তায় এনআইডি পেতেন রোহিঙ্গারা, প্রথম আলো, ২০ নভেম্বর, ২০১৯

[69] https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b155-building-better-future-rohingya-refugees-bangladesh

১৫ মিলিয়ন ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়, যার ফলে উখিয়া ও টেকনাফে পানির সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। উল্লেখ্য টেকনাফ এলাকায় ৬০০ ফুট বা ১০০০ ফুট গভীরতার টিউবওয়েলগুলোতেও পানির সংকট তৈরি হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ছয়

উপসংহার ও সুপারিশ

২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সমন্বয়, আন্তঃযোগাযোগ এবং তদারকিতে ঘাটতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। জনবল ঘাটতির ফলে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। ক্যাম্পভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা মাঝি-কেন্দ্রিক হওয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ডেটাবেইজ-এর অনুপস্থিতি ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতির কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় মানবিক সহায়তায় অনুদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তায় অপ্রতুলতা তৈরি হচ্ছে। আবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিতকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ও অগ্রগতির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের ওপর আর্থিক ঝুঁকি ও অর্থনীতির ওপর চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ও তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকিসহ পরিবেশ ও বনায়ন বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে।

৬.১ সুপারিশ

সমন্বয় ও সক্ষমতা সংক্রান্ত

১. রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্পগুলোকে বিশেষ ও জরুরি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরুর অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আরআরআরসি'র মাধ্যমে করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিসি এবং ইউএনও অফিসকে কাজ শুরুর পূর্বে ও কাজ শেষ হওয়ার পর অবহিত করতে হবে।
২. ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানে একীভূত যাচাই ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আরআরআরসি'র জনবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি সিআইসি'র আওতায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে; প্রতিটি ক্যাম্পে রাতের বেলা ক্যাম্প ইন চার্জদের (সিআইসি) অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
৪. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সিআইসিদের মানবিক নীতিসমূহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাসহ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. মানবিক সহায়তায় খাতভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৬. রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে।
৭. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব নিরূপণ করে তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

৮. মানবিক সহাতায় প্রকল্প, অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত, বাস্তবায়নের স্থান ও অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তা হালনাগাদ করতে হবে।
৯. সিআইসি কর্তৃক ক্যাম্প পর্যায়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে; কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ নিয়ন্ত্রণে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
১০. মানবিক সহায়তায় কার্যক্রম ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি কার্যালয়ে কাঠামোবদ্ধ 'অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা' চালু করতে হবে; ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনের বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।
১১. ক্যাম্প পর্যায়ে প্রতিটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত

১২. রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে প্রত্যাবাসনসহ যেকোনো চুক্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।

সহায়ক তথ্যসূত্র

Anwary, A., (2019), ***'Interethnic Conflict and Genocide in Myanmar'***, Homicide Studies. https://doi.org/10.1177/1088767919827354

Cheung, S. (2012) ***' Migration Control and the Solutions Impasse in South and Southeast Asia: Implications from the Rohingya Experience, Journal of Refugee Studies'***, Volume 25, Issue 1, March 2012, Pages 50–70, https://doi.org/10.1093/jrs/fer048

Chowdhury M.,Williams N, &Thompson.K (October, 2019) ***'The Rohingya refugee crisis in Bangladesh: The management and involvement of local actors'***, Bournemouth Accounting, Finance &Economic series, No28/2019, Bournemouth University.

COAST (2018) ***'Localization of aid transparency in Bangladesh, Transparency, Grand Bargain C-4C and solidarity approach'*** , Dhaka,

Centre for Policy Dialogue (CPD) (2018) ***' Implications of the Rohingya crisis'***, Dhaka

Dussich, J. P. J.(2018)***'The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar'***, Journal of Victimology and Victim Justice, 1(1): 424.https://doi.org/10.1177/2516606918764998

Ewins.P, Harvey.P, Savage.K and Jacobs.A (2006) ***'Mapping the risk of corruption in humanitarian action'*** A report for Transparency International and U4 anti corruption recourse centre.
Geneva Reach initiative (June 2018)***'Joint education Sector Needs Assesment (JENA)'***, Coxs Bazar, Bangladesh

Islam.M.Mohammad and Nuzhath.T (December, 2018) ***'Health Risks of Rohingya refugee population in Bangladesh: A call for global attention'***, J Globe Health, University of Dhaka, Bangladesh.

Ibrahim, A., (2016), ***'The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide'***. Oxford University Press

ISCG (June, 2019), ***'Situation Report Rohingya Crisis'***, Cox's Bazar, Bangladesh

ISCG (July 2019) ***'Situation Report Rohingya Refugee Crisis'***, Cox's Bazar

ISCG (August, 2019)***'Rohingya Humanitarian Crisis: Joint Response Plan, funding update'*** , Cox's Bazar, Bangladesh

M.U. Barkat (July, 2018) ***'CRISIS WITHIN THE CRISIS: A study on impact of Rohingya influx on the host communityin Ukhia and Teknaf, Cox's Bazar'***, COAST, Bangladesh

'Managing the refugee crisisBuilding capabilities to manage refugee influx in country', 2015, Global Crisis Centre. https://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/pwc-managing-the-refugee-crisis.pdf

'Mayanmar: Crims against Humanity terrorize and drive Rohingya Out' , 18 October2017, Amnesty International

P.Julia and F.Elena (July, 2013) ***'Writing the 'other' into humanitarian discourse: framing theory and practice in South-South responses to forced displaced'*** Refugee Studies Centre, University of oxford.

Parnini, S (201) ***'The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh'***, Journal of Muslim Minority Affairs, 33(2): 281297, DOI: 10.1080 /13602004. 2013. 826453

Policy Research Institute (PRI) (July 31, 2019) ***'Rohingya crisis and the host community'***, Dhaka

Relief Web (31 May, 2019**)** ***'Rohingya Refugee Camps Turn to LPG, Reforestation to Save Deplted"***
'Rohingya Influx Overview (RIO)'-April 2019, Coxs Bazar, Bangladesh.
The school of Ethics and Global Leadership (April 2018) ***"The Rohingya Crisis in Mayanmar"*** Washington DC.

'The history of the persecution of Rohingyas', The Conversation, 21 September, 2017https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040

Unicef (August 2019**)** ***' Future in the balance: Building hope for a Generation of Rohingya Children'***, Child alert, Coxs Bazar

Wade, F.(2017) ***'Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim 'Other''***, ZED Books, London.

Yesmin.S (2016) ***'Policy towards Rohingya Refugees: A comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia and Thiland'*** Journal of the Asiatic Society of Bangladesh

স্ফিয়ার প্রজেক্ট (২০১১) ***'মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়াদানের ন্যূনতম মান'*** **,** ফাউন্ডেশন ফর ডিজাস্টার ফোরাম,ঢাকা, বাংলাদেশ

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবসন কমিশনারের কার্যালয় (জুলাই, ২০১৯) ***'মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা ও প্রসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী'***, গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার, কক্সবাজার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কক্সবাজার পরিসংখ্যান, ২০১১

'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যাঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা', টিআইবি, ২০১৭

'গ্লোবাল নেটওয়ার্ক এগেইনস্ট ফুড ক্রাইসিস', *গ্লোবাল রিপোর্ট*, ২০১৯।

'ইসি'র কর্মচারীর সহায়তায় এনআইডি পেতেন রোহিঙ্গারা' , প্রথম আলো, ২০ নভেম্বর, ২০১৯

পরিশিষ্ট

এফডি-৭ এর আওতায় কর্মসূচির অনুমতি প্রক্রিয়া (প্রস্তাবিত)

এফডি-৭ এর আওতায় কর্মসূচি সমাপ্তির ছাড়পত্র প্রক্রিয়া (প্রস্তাবিত)